ধর্ম ও বিজ্ঞান: সংঘাত-সমন্বয় এর প্রশ্নঃ সাবজেকটিভ না অবজেকটিভ?

(শ্রী সুরজিত মুখার্জীর প্রতিক্রিয়ার জবাবে)

মোঃ জানে আলম

‘ধর্ম ও বিজ্ঞানঃ সংঘাত সমন্বয়ের রণনীতি রণকৌশল’ শীর্ষক আমার একটি নিবন্ধ মুক্তমনা ওয়েব সাইটে প্রকাশিত হয়েছে। তার প্রতিক্রিয়ায় শ্রী সুরজিত মুখার্জী ‘ধর্ম ও বিজ্ঞানঃ কোথায় সংঘাত ও কেন সমন্বয়ের প্রশ্ন’ শীর্ষক একটি নিবন্ধ মুক্তমনায় প্রকাশ করেছেন। তারই তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় শ্রী অভিজিৎ রায় তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ একটি প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন। অভিজিৎ রায়ের সুলিখিত প্রতিক্রিয়ায় শ্রী সুরজিত মুখার্জী অনেক প্রশ্নের যথার্থ জবাব পেয়েছেন বলে আমার মনে হয়। তথাপি যে সকল বিষয় শ্রী অভিজিৎ রায়ের লেখায় আসেনি, সে সকল বিষয়ে মূল নিবন্ধের লেখক হিসাবে কোন মতামত না দিলে সাধারণ পাঠক বিভ্রান্তির সুযোগ থেকে যায় বিধায় আমার এ প্রয়াস।

প্রথমত, আমি সুরজিত মুখার্জীকে ধন্যবাদ জানাই, আমার নিবন্ধটি মনোযোগ দিয়ে পাঠ করার জন্য। তার প্রতিক্রিয়ার শুরুতে আমার লেখার গুণগত মান নিয়ে তার মন্তব্যের জন্যও তাকে ধন্যবাদ। সুরজিত বাবুর প্রতিক্রিয়ার শিরোনাম থেকে বুঝা যাচ্ছে, তিনি বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে সংঘাতের কোন কারণ দেখতে পাচ্ছেন না। তার মতে, সংঘাত যেখানে নেই, সেখানে আবার সমন্বয়ের প্রশ্ন কেন? তার প্রতিক্রিয়ায় সুরজিত বাবু আমার নিবন্ধের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ এনেছেন, আমি ধর্ম ও বিজ্ঞানের তুলনা করতে গিয়ে বিজ্ঞানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছি এবং ধর্মকে তুলাধোনা করেছি এবং বিজ্ঞানকে ধর্মের উপরে স্থান দিয়েছি। দু’টি পরস্পর বিরোধী তত্ত্ব বা দর্শনের তুলনামূলক আলোচনায় দুটোকে কি সঠিক বলার সুযোগ থাকে? যুক্তিবাদ সে কথা কি সমর্থন করে?

দ্বিতীয়ত, তিনি বলেছেন, বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের তুলনা পড়ে তার মনে হয়েছে, এ যেন রজনী গন্ধা ফুলের সাথে হিমসাগর আমের তুলনার মত উদ্ভট। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, ইতিহাসের সাথে ভুগোলের কেন তুলনা করা হয়না। তিনি একটি দারুণ কথা বলেছেন, “প্রাচীন ধর্মের (সৎ) প্রণেতাদের যদি জানা থাকত যে ভবিষ্যতে বিজ্ঞান নামে জ্ঞানের একটি শাখা তৈরী হবে, যাতে প্রমাণ ও পর্যবেক্ষণ ব্যতিরেকে কোন কিছুরই অস্তিত্ব স্বীকার করা যাবেনা এবং ভবিষ্যতে বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদী মানুষেরা ধর্ম সম্বন্ধীয় যাবতীয় তত্ত্বকে ভূয়া বিশ্বাস ভিত্তিক আখ্যা দিয়ে উড়িয়ে দেবে, তাহলে তারা হয়তো অযথা সৃষ্টি, প্রকৃতি ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ব্যাখ্যা এবং তার একটি অতিমানবিক সৃষ্টিকর্তার যোগসূত্র ইত্যাদি বিষয়ে মতিস্ক ব্যয়ে বিরত থাকতেন অথবা মতবাদ প্রেরণে অপেক্ষাকৃত সর্তক থাকতেন। ” তার এ উক্তি থেকে তিনটি স্বীকারোক্তি বের হয়ে আসে, এক, সব ধর্মপ্রণেতারা সৎ ছিলেন না ; দুই, তাদের মতবাদ প্রেরণে আরো সর্তক হওয়ার অবকাশ ছিল, তিন, তারা অযথা সৃষ্টি, প্রকৃতি ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ব্যাখা এবং তার একটি সৃষ্টিকর্তার যোগসুত্র ইত্যাদি

বিষয়ে মস্তিষ্ক ব্যয় করেছেন। সুরজিত বাবুরতো না জানার কথা নয় যে, ধর্মীয় দর্শনের মূল বিষযতো জগৎ ও জীব সৃষ্টি সম্পর্কে তার মতবাদ। তা বাদ দিলে ধর্মীয় দর্শনের আর থাকে কি? তিনি লিখেছেন, ‘পক্ষপাতদুষ্ট যুক্তিবাদ ধর্মান্ধ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মতবাদের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়’। প্রিয় সুরজিত বাবু, যুক্তিবাদ হল সত্যে উপনীত হওয়ার একটি দার্শনিক পদ্ধতি। কার্য-কারণ সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে অবরোহ-আরোহ পদ্ধতিতে কোন বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছার পদ্ধতি হল যুক্তিবাদ। এর কোন পক্ষ থাকেনা। যুক্তির পক্ষ বা বিপক্ষ একমাত্র অধিকতর যুক্তি বা পাল্টাযুক্তি। সর্বাপেক্ষা মারাত্মক কথা তিনি লিখেছেন, “যুক্তিবাদীদের মধ্যে কিছ্ু সংখ্যক আছে যাদের কাজ হল ধর্মগ্রন্থগুলি পাঠ করে শুধুমাত্র সেগুলির মধ্যে দ্বন্দমূলক, ত্রুটিপূর্ণ এবং বিভ্রান্তিকর কী কী আছে তা নির্ধারণ করা, আর যদি তাতে কিছু সত্যতা থেকে থাকে, তা সযত্নে এড়িয়ে গিয়ে ধর্মকে নিছক একটি বিশ্বাসভিত্তিক সম্পূর্ণ ভ্রান্ত তাত্ত্বিক মতবাদ বলে যুক্তি স্থাপন করা।” সুরজিত বাবু , ধর্মগ্রন্থে কিছু কিছু দ্বন্দ্বমূলক, ত্র“টিপূর্ণ এবং বিভ্রান্তিকর বিষয় আছে নাকি? কী কথা শুণি আজ মন্থরার মুখে! সুরজিত বাবু হয়ত ভুলে গেছেন, সব ধর্মগ্রন্থে বিশ্বাসীরা দাবী করেন, তাদের ধর্মগ্রন্থ ঐশী বাণী। ধর্মগ্রন্তগুলোতেও সে কথা বলা আছে। তা যদি সত্য হয়, তাহলে তাতে কিছু কিছু দ্বন্দ্বমূলক, ত্র“টিপূর্ণ এবং বিভ্রান্তিকর বিষয় থাকে কিভাবে ? তাহলে স্রষ্টাও কি ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে নন ? সাবধান সুরজিত বাবু! এ কথা মুখে আনলে মৌলবাদীরা রে রে করে তেড়ে আসবেন। ধর্মের পক্ষে বলেও শেষ পর্যন্ত নিজের পৈত্রিক প্রাণটা নিয়ে টানাটানি হতে পারে। এভাবে সুরজিত বাবুর আরো অনেক বক্তব্য উদ্বৃত করে আলোচনার অবকাশ থাকলেও নিবন্ধের আকারের কথা বিবেচনা করে তা করলাম না। তবে তার শেষ আশাবাদটি এমন ধর্মের বিজ্ঞানের সঙ্গে সংঘাত বা সমন্বয়ের কোন প্রশ্নই উঠবেনাÑ নিয়ে অবশ্যই আলোচনা করতে হয়। কারণ ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে সংঘাতটা কী সাবজেকটিভ না অবজেকটিভ, তা বুঝতে পারলে সুরজিত বাবু এমন আশাবাদ ব্যক্ত করতেন না। জন্ম ও বিকাশগত কারনে ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের যে বিরোধ বা সংঘাত তা অবজেকটিভ। এটা কোন ব্যক্তি, বৈজ্ঞানিক, ধর্মবেত্তা বা ধার্মিক লোকের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করেনা। হ্যা, বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের সমন্বয় করার প্রয়াসটা সাবজেকটিভ। এটা মানুষের সমসাময়িক কালের প্রয়োজনে, আর্থ-সামাজিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক কিংবা রাজনৈতিক প্রয়োজনে বা উদ্দেশ্যে মানুষ করতে পারে বা করে থাকে। ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের সমন্বয় না করলে তাতে বিজ্ঞানের কিছু যাবে আসবেনা, বরং নিজের অস্থিত্ব ঠিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে ধর্ম এখন বিজ্ঞানের আশ্রয় খুঁজছে, বিজ্ঞান দিয়ে ধর্মের খাটিত্ব প্রমাণের প্রাণান্তকর প্রয়াস চলছে। কিন্তু ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে সংঘাতটা মানুষের ইচ্ছানিরপেক্ষ। বিজ্ঞানের যত জয়, ধর্মের তত ক্ষয় এ দুই দর্শনের বিকাশ ও অগ্রগতির মাত্রা ব্যস্তানুপাতিক। সুরজিত বাবুদের মত অনেকের কাছে বেদনাদায়ক হলেও এটাই সত্য। কবিগুরুর ভাষায়, সত্য যে কঠিন, সে কঠিনেরে ভালবাসিলাম।

ধর্ম ও বিজ্ঞানের সাথে সংঘাত কেন, কেনইবা সমন্বয়ের প্রশ্নটি সামনে আসছে, কিংবা ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের তুলনা কেন, এ সকল প্রশ্নের সঠিক জবাবের মধ্যেই সুরজিত বাবু তার অনেক প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবেন। বস্তত এ প্রশ্নের জবাব নিহিত আছে ধর্ম ও বিজ্ঞানের জন্মের মধ্যেই। সুরজিত বাবু ঠিকই বলেছেন, রজনীগন্ধার সাথে হিমসাগর আমের তুলনা চলেনা, তুলনা করা হয়না ভুগোলের সাথে ইতিহাসের। পাল্টা প্রশ্ন সুরজিত বাবুকেই, কেন তা করা হবে ? দু’টাতো এক বিষয় নয়। তুলনা চলবে

রজনীগন্ধার সাথে রজনী গন্ধার, বাংলাদেশী রজনীগন্ধার সুগন্ধ নাকি জাপানের রজনীগন্ধার সুগন্ধ বেশি, কিংবা কোনটি বেশী শুভ্র, ডাটা মোটা, পাপড়ি বড় ইত্যাদি ইত্যাদি। ইতিহাসের সাথে তুলনা চলে ইতিহাসের কাদের ইতিহাস সমৃদ্ধ, বাঙালির না পাঞ্জাবীর, প্রাচ্যের না প্রতীচ্যের। ভূগোল এর সাথে ভূগোলেরও এ তুলনা চলে, কোন দেশের ভূ-প্রকৃতি কেমন, কেমন তার প্রাকৃতিক গড়ন ইত্যাদি ইত্যাদি। একই ধরনের বস্তুর সাথে বস্তুর, মানুষের সাথে মানুষের এবং প্রাণীর সাথে প্রাণীর যে তুলনা চলে সেকথা বুঝার জন্য কাউকে কম্পিউটার বিজ্ঞানী হওয়ার প্রয়োজন নেই । ক্রিকেটার আক্রাম না ফুটবলার আলফাজ ভাল খেলে, প্রশ্নটাই যেমন অবান্তর, তেমন অবান্তর আম মজা না কাঁঠাল মজা প্রশ্নটিও। কিন্তু ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের তুলনাকে সুরজিত বাবু এ রকম অবান্তর তুলনা বলে কেন মনে করলেন? এখানে বিজ্ঞান ও ধর্ম সম্পর্কে তার উপলব্ধির বিভ্রান্তি কাজ করেছে নিঃসন্দেহে। ধর্ম ও বিজ্ঞান দুটোই যে দর্শন তবে জন্ম ও বিকাশগত কারণে পরস্পরবিরোধী দর্শন । তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্বটি রীতিমত বৈরী দ্বন্দ্ব। বিপত্তিটা এখানেই। যেহেতু দু'টি দর্শন পরস্পর বিরোধী, সেহেতু দু'টিই সত্য হতে পারে না। এখানে একটাকেই সত্য বলে মেনে নিতে হবে। ধর্মীয় দর্শনের মূল ভিত্তি হল জগৎ ও জীব এর জন্ম ও বিকাশ, মৃত্যু ও লয় এবং তার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কালক্রমে মানুষের মনে গড়ে ওঠা গুচ্ছ গুচ্ছ বিশ্বাস বা ধারণা। সে দর্শনের উপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হয়েছে কিছু ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক আচার-আচরণ বিশেষভাবে স্রষ্টাকে সন্তুষ্ট করার জন্য অহর্নিশ প্রার্থনা বা উপাসনা। স্রষ্টা বা সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস, তার সন্তুষ্টি বিধান করে পরলৌকিক মুক্তি বা মোক্ষলাভ হল ধর্মীয় আচরণ বা উপসানার মূল কথা। এখানে ব্যক্তি বা সমাজের কল্যাণার্থে যা কিছু করতে বলা হয়েছে, তারও প্রণোদনা কিন্তু স্রষ্টার সন্তুষ্টি, বিনিময়ে স্বর্গ লাভ। ধর্মীয় দর্শন চিন্তা করে ব্যক্তি মানুষের মুক্তি তথা পরলৌকিক মুক্তি নিয়ে, যার মূল কথা মৃত্যুর পর সে স্বর্গে যাবে না নরকে যাবে। পক্ষান্তরে বৈজ্ঞানিক দর্শনের ভিত্তি হল কিছু তত্ত্ব-সমষ্টি অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষন ও পরীক্ষণের মাধ্যমে যা সৃষ্টি হয়েছে। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা দর্শনের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেছে প্রযুক্তি, যা মানুষের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন, এমনকি রাষ্ট্রীয় জীবনকে পর্যন্ত পাল্টে দিয়েছে। এখানে মানুষের পরলৌকিক জীবনের কোন স্থান নেই। স্বর্গে যাওয়ার আশায় কোন বিজ্ঞানী তার গবেষণা পরিচালনা করেন না। সত্যকে জানা, জ্ঞানের অনুসন্ধান ও মানবগোষ্ঠীর কল্যাণে নিত্য নতুন আবিস্কার, এ হলো একজন বিজ্ঞানীর মহানব্রত। এর জন্য বিধাতা পুরুষ তাকে স্বর্গে না নরকে পাঠাবে সেটা নিয়ে তারা মোটেও চিন্তিত নন। পক্ষান্তরে একজন ধার্মিক বা ধর্মবেত্তাদের সকল ধর্মীয় ক্রিয়া-কর্মের লক্ষ্য পরলৌকিক মুক্তি । তাই ধর্মীয় দর্শনের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা বিধি-বিধান কেবল মানুষের সে সকল আচার-আচরণ নিয়ে মাথা ঘামায়, যা মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত কিংবা পারিবারিক বিষয়। সমাজ ও সভ্যতাকে সচল রাখার যে ভিত্তি বস্তুগত উৎপাদন তাতে ধর্মের কোন ভূমিকা নেই। আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, প্রাথমিকভাবে ধর্মীয় দর্শনের সৃষ্টি হয় জীব ও জগৎ সৃষ্টি সম্পর্কিত মতবাদের উপর ভিত্তি করে- যদিও এ মতবাদ ক্রমান্বয়ে বিবর্তিত হয়েছে। মজার ব্যাপার হল, এ বিষয়েও সকল ধর্মের মত কিন্তু এক নয়; বরং পরস্পরবিরোধী। কিন্তু জীব ও জগৎ সৃষ্টি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক মতবাদে কোন পরস্পর বিরোধীতা বা স্ববিরোধীতা নেই যদিও সে মতবাদের বিবর্তন ও বিকাশ আছে। মানব সভ্যতার আদি যুগে বিশাল প্রকৃতি, আকাশ-বাতাস, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহতারা, নদী-পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল ইত্যাকার জিনিষগুলো ছিল মানুষের কাছে অপার বিস্ময়। কারণ মানুষ সেদিন শুধু হাতিয়ারের দিক থেকে নয়, মননের দিক থেকেও ছিল নিতান্ত অপরিপক্ষ ও

অসহায়। কে সৃষ্টি করল বৈচিত্রময় এ জগত ও জীবন জন্ম থেকেই এসব ভাবনা মানুষের মনে উদয় হয়েছে। তার যুক্তিসঙ্গত জবাব তারা খুঁজে পেল একজন সৃষ্টিকর্তাকে আবিস্কার করে। তাই বলা চলে, আদিম মানুষ শুধু ধর্ম সৃষ্টি করেন নি, তার সাথে একজন সৃষ্টিকর্তাও সৃষ্টি করেছেন। তাহলে দাঁড়াল কী ? সৃষ্টিকর্তা মানুষ সৃষ্টি করেন নি বরং মানুষই তার প্রয়োজনে সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টিকর্তাকে। বস্তুত সেদিনের প্রেক্ষাপটে তাই ছিল যুক্তিসঙ্গত। রীতিমত অকাট্য যুক্তি সৃষ্টিকর্তা না থাকলে সৃষ্টি কোত্থেকে আসে। তাহলে সৃষ্টিকর্তা আসল কোত্থেকে তখনো সে প্রশ্ন করার বুদ্ধি মানুষের হয়নি। কালক্রমে পাথরে পাথরে ঘর্ষণ করে আগুন আবিস্কার, পাথর ঘঁষে হাতিয়ার তৈরী ইত্যাদি উপায়ে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের ফলে মানুষের চেতনারও বিকাশ ঘটতে থাকে। মানুষের বুদ্ধির বিকাশ, মানুষের মধ্যে যুক্তিবোধ ও কার্য-কারণ সম্পর্ক বিষয়ে ভাবনার উদ্রেক, জীব ও জগৎ সৃষ্টি সম্পর্কে মানুষের সনাতন বিশ্বাসে চিড় ধরাতে লাগল। বিশ্ব মানবগোষ্ঠীর সমাজ সভ্যতা যখন সামন্তবাদী উৎপাদন সম্পর্কের নিগড়ে আবদ্ধ ছিল, তখন পর্যন্ত ধর্মীয় চেতনাই সমাজের মূলচেতনা হিসাবে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু সামন্তবাদী সমাজের জঠর ছিঁড়ে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের উদ্ভব ও বিকাশ ক্রমে ধর্মীয় চেতনাকে অপসারিত করে বিজ্ঞানকে সমাজের মূল চেতনায় অভিসিক্ত করল । সৃষ্টিকর্তা না থাকলে কোন কিছু সৃষ্টি হয় কিভাবে, সে যুক্তির পিঠে আসল পাল্টা প্রশ্ন, তাহলে সৃষ্টিকর্তাকে সৃষ্টি করল কে। ‘ঘড়ি-মেকার’ তত্ত্বের জনকেরা এখানে হতভম্ব হলেও ধর্মবেত্তারা তাতে হতোদ্যম না হয়ে তাদের তাৎক্ষণিক জবাব তিনি স্বয়ম্ভু। নাছোড়বান্দা বিজ্ঞান তখন প্রশ্ন ছুড়ে দেয়, সৃষ্টিকর্তা স্বয়ম্ভূ হলে প্রকৃতি স্বয়ম্ভূ হতে বাঁধা কোথায়? প্রিয় শ্রী সুরজিত মুখার্জী, এতক্ষণে আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, ধর্ম ও বিজ্ঞানের সংঘাতটা কোথায়? আর সমন্বয়ের প্রয়োজন বিজ্ঞানের স্বার্থে নয়, মানুষের স্বার্থে আজন্ম লালিত ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধের নিকষকালো আঁধারে ঢাকা অচলায়তন থেকে মানুষকে ধীরে ধীরে জ্ঞানের আলোতে উদ্ভাসিত মুক্ত জগতে নিয়ে আসার রণকৌশল হিসাবে। তাতে ধর্ম হয়ত কিছু দিনের জন্য পার পেয়ে যাবে, অর্থাৎ দীর্ঘজীবি হবে, তবে চিরজীবি হবে না কখনো। অনাগত ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের আরো পিলে চমকানো ও অভাবিত বিকাশে আপনি আচরি মরে যাবে ধর্ম, ঠাঁই করে নিবে মানব সভ্যতার মিউজিয়ামে পরিণত হবে গবেষণার বস্তুতে আগামী প্রজন্মের কাছে।

মোঃ জানে আলম, গবেষণা, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান বিষয়ক সম্পাদক, গণফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটি। ইমেইল- jalamadv@yahoo.com